অধ্যায় - ২

গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য, কার্য্য শুরু করাতে অসামর্থতা ও সাহস, গম্ভীর তর্ক-বিতর্ক, অর্থপূর্ণ উপাধি 'হেমাডপন্ত', গুরুর প্রয়োজন।

গত অধ্যায়ে গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে সেই সব কারণগুলি আলোচনা করেছেন, যার দ্বারা তিনি গ্রন্থ রচনার কার্য্য আরম্ভ করার প্রেরণা পান। এবার তিনি এই গ্রন্থটি পাঠ করার যোগ্য অধিকারী এবং অন্যান্য বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিবেচনা করেছেন।

গ্রন্থ লেখার কারণ

বাবা কিভাবে বিসুচিকা রোগের প্রকোপ আটা পিষে এবং সেটা গ্রামের বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে থামান এবং এই রোগ সম্পূর্ণরূপে উন্মুলন করে দেন - এই লীলা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি আরো অনেক লীলা শুনেছি, যার দ্বারা আমার মন অফুরন্ত আনন্দে ভরে যায় এবং এই আনন্দের স্রোতই কাব্য রূপে প্রকাশ হয়েছে। আমার এ কথাও মনে হলো যে, এই মহান ও আশ্চর্য্যজনক লীলার বর্ণনা বাবার ভক্তবৃন্দের জন্য অত্যন্ত মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ প্রমাণিত হবে। এই লীলামৃত পান করলে তাদের পাপ সমূলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমি বাবার পবিত্র জীবনগাথা এবং তাঁর মধুর উপদেশ লিখতে আরম্ভ করলাম। শ্রী সাইয়ের জীবনী জটিল বা সংকীর্ণ কোনটাই নয়, বরং সত্য ও আধ্যাত্মিক পথের বাস্তবিক দিগ্দর্শন করায়। শ্রী হেমাডপন্তের মনে হয় যে, উনি এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পাত্র নন- "আমি তো নিজের প্রিয় বন্ধুর জীবনীর সম্বন্ধে ভালভাবে পরিচিত নই আর নাই নিজের প্রকৃতির বিষয়ে, তাহলে আমার মত এক মূঢ় মানুষ একজন এমন মহান সৎপুরুষের জীবনী লেখার দুঃসাহস কি করে করতে পারে? অবতারদের প্রবৃত্তির বিষয় বর্ণনা করতে বেদও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে। কোন মহাপুরুষের বা সন্তের চরিত্র বোঝার জন্য সর্বাগ্রে নিজে সন্ত সদৃশ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সেই হিসেবে তাঁর লীলার গুণগান করার ক্ষেত্রে আমি সর্বরূপে অযোগ্য। সাধুপুরুষের জীবনী লেখার জন্য মহান সাহসের দরকার এবং এমন যেন না হয় যে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।" এই আমার একমাত্র সংশয়। তাই শ্রী বাবার কৃপা অর্জন করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করি।

মহারাষ্ট্র প্রান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত শ্রী জ্ঞানেশ্বর বলেছিলেন যে, সন্তচরিত্র যে রচনা করে তার প্রতি ভগবান বিশেষ প্রসন্ন হন। ভক্তরা সাধু-সন্তের সেবা করার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন। ওদিকে সন্তরাও কার্য্যটিকে বিচিত্র রূপে সম্পন্ন করিয়ে নেন। আসল প্রেরণা তো সন্তরাই দেন, ভক্ত তো নিমিত্ত মাত্র বা বলা যেতে পারে যে এক যন্ত্রস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ কবি মহীপতি সন্ত-চরিত্র লেখার প্রেরণা পান। এই অন্তঃপ্রেরণার ফলস্বরূপই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। ঠিক এইভাবেই শ্রী দাসগণুর সেবা স্বীকৃত হয়েছিল। মহীপতি চারটি কাব্য রচনা করেন - 'ভক্তবিজয়,' 'সন্তবিজয়,' 'ভক্তলীলামৃত' এবং 'সন্তলীলামৃত।' দাসগণু দুটি কাব্য লেখেন, 'ভক্তলীলামৃত' ও 'সন্তকথামৃত' - যেগুলিতে আধুনিক সন্তদের চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। 'ভক্তলীলামৃত' -তে অধ্যায় ৩১, ৩২ ও ৩৩ ও 'সন্তকথামৃত'-তে অধ্যায় ৫৭তে শ্রী সাই বাবার মধুর জীবনী ও তাঁর অমৃততুল্য উপদেশ খুবই সুন্দর ও মনোরঞ্জকভাবে লেখা হয়েছে। এইগুলি শ্রী সাইলীলা পত্রিকার ১১, ১২, ও ১৩ অঙ্কে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দকে এইগুলি পড়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই। এই রকমই শ্রী সাই বাবার অদ্ভুত লীলার বর্ণনা একটি ছোট্ট পুস্তকে - ('শ্রী সাইনাথ ভজনমালা') বান্দ্রার শ্রীমতি সাবিত্রীবাঈ রঘুনাথ তেন্দুলকর খুবই সুন্দর ভাবে করেছেন।

শ্রী দাসগণু মহারাজও শ্রী সাই বাবার মহিমার বিষয়ে অনেক মধুর কবিতা রচনা করেছেন। আরেক ভক্ত শ্রী অমীদাস ভবানী মেহতাও বাবার কিছু কথা-কাহিনী গুজরাতীতে প্রকাশিত করেছেন। 'সাইপ্রভা' নামক পত্রিকাতেও কিছু লীলা শিরডীর সংস্থান দ্বারা প্রকাশিত করা হয়েছে। এবার একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে যে, যখন শ্রীসাইনাথ মহারাজের জীবনের উপর আলোকপাত করার জন্য এত সাহিত্য রয়েছে তখন আরেকটি গ্রন্থ 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' রচনা করার আবশ্যকতাটাই বা কি? এর উত্তরে শুধু এই বলা যেতে পারে যে, শ্রী সাইবাবার জীবনী মহাসাগরের ন্যায় অগাধ, বিস্তৃত। যদি এর গভীরে ডুব দেওয়া হয়, তাহলে জ্ঞান ও ভক্তি রূপী অমূল্য রত্ন সহজেই পাওয়া যাবে। শ্রী সাইবাবার জীবনী, তাঁর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ মহান ও আশ্চর্য্যজনক। দুঃখী ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত জন এর দ্বারা সুখ এবং শান্তি ও পরলোকে শ্রেয়স প্রাপ্ত করবে। **যদি শ্রী সাইবাবার উপদেশগুলি (যেগুলি বৈদিক শিক্ষার ন্যায় মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ) মন দিয়ে শ্রবণ ও মনন করা হয় তাহলে ভক্তরা সহজেই নিজেদের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত করতে পারবেন,** অথবা ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা, অষ্টাঙ্গ যোগের সিদ্ধি, ধ্যানের মধ্যে আনন্দ ইত্যাদির প্রাপ্তি বড় সহজেই হয়ে যাবে। এইরূপ ধারণা মনে উদ্ভব হওয়ায় আমি চরিত্রের কথাগুলি সংকলন করতে আরম্ভ

করে দিই। সাথে-সাথে মনে এই বিচারটিও উদয় হয় যে, আমার জন্য সবচেয়ে উত্তম সাধনাও এইটিই। যে সরল সহজ জন বাবার দর্শন দ্বারা নিজেদের দৃষ্টি ধন্য করার সৌভাগ্য পায়নি তাদের জন্য এই চরিত্র অতন্ত আনন্দদায়ক হবে।

অতএব আমি নিজের অহংকার তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করে দিলাম। আমার মনে হল এর পর আমার পথ সহজতম হয়ে গেছে এবং বাবাই আমায় ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করবেন। কিন্তু গ্রন্থ লেখার বিষয়ে বাবার অনুমতি নিতে সাহস হচ্ছিল না। অতএব আমি মাধবরাওকে (উপনাম শামা), যাঁকে বাবার অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী মানা হয়, এই কাজের ভার দিই। তিনি আমার হয়ে বাবার কাছে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উনি বাবার কাছে বিনম্র শব্দে এইরূপ প্রার্থনা করেন- "এই আন্নাসাহেব আপনার জীবনী লিখবার জন্য অতি উৎসুক। তাই কিন্তু আপনি দয়া করে এমনটি বলবেন না যে, আমি তো এক ফকির, আমার জীবনী লিখবার দরকারটাই বা কি? কেবল আপনার কৃপা ও আজ্ঞার আশীর্বাদ পেলেই ইনি সেটা লিখতে পারবেন। আপনার শ্রীচরণের পুণ্যপ্রতাপই এই কার্য্যটিকে সম্পূর্ণ রূপে সফল করবে। আপনার অনুমতি বা আশীর্বাদের অভাবে কোন কাজই যশস্বী হতে পারে না।" এই রূপ প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয়। তিনি আমায় উদী দিয়ে, নিজের বরদহস্ত আমার মাথায় রেখে আশীস দিয়ে বললেন- "এঁকে জীবনী ও দৃষ্টান্তগুলি একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করতে দাও, আমি এঁকে সাহায্য করব। **আমি স্বয়ং নিজের জীবনী লিখে ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করব।** কিন্তু এঁর নিজের অহংকার ত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ করা উচিত। যে নিজের জীবনে এইরূপ আচরণ করে তাকে আমি অত্যধিক সাহায্য প্রদান করি। যখন এঁর অহং সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং খুঁজলেও লেশমাত্র পাওয়া যাবে না, তখন **আমি এঁর অন্তঃকরণে প্রকট হয়ে নিজের জীবনী লিখব। আমার চরিত্র এবং উপদেশগুলি শ্রবণ করামাত্র ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জেগে উঠবে এবং সহজেই আত্মানুভূতি ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হবে।** গ্রন্থে নিজের মতের সমর্থনে এবং অন্যদের মতকে খন্ডন করার জন্য তথা অন্য কোন বিষয়ের পক্ষপাত করা বা ব্যর্থ বাদবিবাদের কুচেষ্টা থাকা উচিত নয়।"

অর্থপূর্ণ উপাধি 'হেমাডপন্ত'

'বাদ-বিবাদ' শব্দটা লিখতেই মনে পড়ল যে, আমি পাঠকগণকে কথা দিয়েছি 'হেমাডপন্ত' উপাধিটি আমি কি করে পেলাম সেটা বর্ণনা করব। এবার আমি সেটাই বিস্তারিত রূপে লিখছি।

শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত ও নানাসাহেব চাঁদোরকরকে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে গন্য করা হয়। ওঁরাই আমাকে শিরডী গিয়ে শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে অনুরোধ করেন। আমিও তাঁদের কথা দিই, কিন্তু নানারকম বাধা উৎপন্ন হওয়ায় আমার শিরডী যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে লোনাওয়ালায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওঁরা যথাসাধ্য সব রকমের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করেন, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয় ও জ্বর কোন রকমেই কমে না। শেষে ওঁরা নিজেদের গুরুদেবকে ছেলের মাথার কাছে বসান, কিন্তু পরিণাম যে কে সেই থাকে। এই ঘটনাটি দেখে আমার মনে হয় যে, যদি গুরু একটি ছেলের প্রাণও রক্ষা না করতে পারেন, তাহলে তাঁর উপযোগিতাই বা কি? এবং যখন তাঁর মধ্যে কোন সামর্থই নেই তখন আর শিরডী যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন? এই ভেবে আমি শিরডী যাওয়া স্থগিত করে দিই। কিন্তু যা হওয়ার তাতো হবেই। প্রান্তাধিকারী নানাসাহেব চাঁদোরকর বসই ট্যুরে যাচ্ছিলেন। উনি থানা থেকে দাদার পৌঁছন এবং বসই যাওয়ার গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময় বান্দ্রা লোকাল এসে পৌঁছয়, যাতে চড়ে উনি বান্দ্রা পৌঁছান এবং শিরডী যাত্রা স্থগিত রাখার জন্য আমায় বকুনি দেন। নানা সাহেবের বক্তব্য আমার প্রায় ঠিকই মনে হয়। ফলতঃ সেই রাতেই শিরডী রওনা হওয়া স্থির করি। আমি সোজা দাদার গিয়ে ওখান থেকে মনমাডের ট্রেন ধরব ভেবেছিলাম। এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে আমি দাদারের ট্রেনে গিয়ে উঠলাম। ট্রেন ছাড়বে এমন সময় একটি মুসলমান আমার কম্পার্টমেন্টে ঢোকে ও আমার জিনিষপত্র দেখে আমার গন্তব্যস্থানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। আমিও তাকে নিজের যাত্রার বিষয় সব খুলে বলি। তখন সে আমায় জানায় যে, মনমাডের গাড়ী দাদার স্টেশনে দাঁড়ায় না, অতএব সোজা 'বোরীবন্দর' যাওয়া উচিত। এই ঘটনাটি যদি না ঘটত, তাহলে হয়তো পরের দিন শিরডী না পৌঁছতে পারার জন্য নানারকমের কুশঙ্কাদ্বারা আক্রান্ত হতে হতো। কিন্তু তা হয় না। ভাগ্যক্রমে পরের দিন সকাল নটা নাগাদ শিরডী পৌঁছিলাম। এই ঘটনাটি ১৯১০ সালে ঘটে যখন প্রবাসী ভক্তদের থাকার জন্য 'সাঠে ওয়াড়া'-ই একমাত্র স্থান ছিল। টাঙ্গা থেকে নেমেই আমি শ্রী সাইবাবার দর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। ঠিক সেই সময় ভক্ত প্রবর শ্রী তাত্য়া সাহেব নুলকর মস্‌জিদ থেকে ফিরছিলেন। উনি আমায় জানালেন- 'এই সময় বাবা মস্‌জিদের মোড়েই আছেন। এখন প্রারম্ভিক দর্শন বা 'ধূলি ভেট' করে নাও, তারপর স্নানাদি সেরে দর্শন কোরো।" একথা শোনামাত্র আমি দৌড়ে গিয়ে বাবার দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করি। আমার আনন্দের সীমা রইল না। মনে হচ্ছিল যেন আমি কি না কি পেয়ে গেছি। আমার শরীর উল্লসিত হয়ে ওঠে।

ক্ষিধে বা তেষ্টার কোন বোধই রইল না। যে মুহূর্তে তাঁর ভববিনাশকারী চরণের স্পর্শ পেলাম, তখন থেকেই আমার জীবনে এক নতুন আনন্দ প্রবাহিত হতে শুরু হয়। সে কথা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। আমি সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে মানসিক প্রণাম করি। আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে সাই দর্শনের এক বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁর দর্শনের ফলস্বরূপ বিচার পরিবর্তণ হয়- বিগত কর্মের প্রভাব ক্ষীন হয়ে যায় এবং ধীরে-ধীরে অনাসক্তি ও সাংসারিক ভোগের উপর বৈরাগ্য বাড়তে থাকে। শুধু গত জন্মের অনেক শুভ সংস্কারের ফলস্বরূপই এইরকম দর্শন পাওয়া সম্ভব। পাঠকগণ, আমি আপনাদের শপথ করে বলতে পারি যে, যদি আপনারা সাই বাবাকে এক পলক দেখেন, তাহলে সমগ্র বিশ্বই আপনাদের সাইময় মনে হবে।

তুমুল তর্ক

শিরডী পৌঁছে প্রথম দিনই বালাসাহেবের সাথে গুরুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক বেঁধে যায়। আমার মতে নিজের স্বাধীনতা ছেড়ে কারো পরাধীন কেনই বা হওয়া এবং যখন কর্ম করতেই হয় তখন গুরুর কিই বা প্রয়োজন? প্রত্যেককে নিজের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। গুরু শিষ্যের জন্য করেনই বা কি? তিনি তো সুখ-নিদ্রার আনন্দ নেন। এইভাবে আমি স্বতন্ত্র থাকার পক্ষ নিই এবং বালাসাহেব প্রারব্ধের। তিনি বললেন- 'যা ভাগ্যে লেখা আছে, সেটা তো ঘটবেই - সেটা উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষও বদলাতে অসফল হয়ে যান। কথায় বলে- ভাবি এক, হয় আরেক।

তারপর পরামর্শের সুরে বললেন- "ভাই, তোমার এই বিদ্যে-বুদ্ধি ছেড়ে দাও। এইরকম অহংকার তোমায় কোনভাবে সাহায্য করবে না।" এইরূপ দুপক্ষের তর্কা-তর্কিতে প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। শেষে নিরুপায় হয়ে বিবাদ স্থগিত করতে হলো। কিন্তু এর ফল এই হলো যে, আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে গেলো এবং আমি এটাই অনুভব করলাম যে, যতক্ষন গভীর দৈহিক বুদ্ধির আবরণে থাকা হয়, ততক্ষনই এইরূপ অহংকার ও বিবাদ সম্ভব। বস্তুতঃ সব বিবাদের জড়ই হচ্ছে এই অহংকার। এরপর অন্যান্যদের সাথে যখন মস্‌জিদ পৌঁছই তখন বাবা হঠাৎ কাকা সাহেব দীক্ষিতকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেন- "সাঠে-ওয়াড়ায় কি চলছিল? কি বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল?" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- "এই হেমাডপন্ত কি বলছিলেন?" এ কথাটি শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সাঠে-ওয়াড়া এবং মস্‌জিদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব আছে। সর্বজ্ঞ বা অন্তর্যামী না হলে বাবা তর্কের কথা কি করে জানতে পারতেন?

আমার বার-বার মনে হচ্ছিল বাবা আমায় 'হেমাডপন্ত' নামে কেন সম্বোধন করলেন? এই শব্দটি তো 'হেমাদ্রিপন্ত'-য়ের অপভ্রংশ। হেমাদ্রিপন্ত দেবগিরির যাদব রাজবংশের মহারাজা মহাদেব ও রামদেবের বিখ্যাত মন্ত্রী ছিলেন। উনি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান এবং উত্তম স্বভাবের লোক ছিলেন। 'চতুর্বর্গ চিন্তামনি' (যাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা আছে) এবং 'রাজ প্রশান্তি'-র মতন অতি উত্তম কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়াও হিসেব রাখার নবীন প্রণালী ও "মোদী-লিপিমালার (মারাঠী সর্ট হ্যাণ্ড) তিনিই জন্মদাতা। সে জায়গায় কোথায় আমি এক অজ্ঞানী, মূর্খ ও অল্পবুদ্ধি মানুষ। তাই বুঝতে পারছিলাম না যে, আমাকে এই বিশেষ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার তাৎপর্য্য কি হতে পারে? গভীর বিশ্লেষণের পর এটাই মনে হলো যে, বোধহয় আমার অহংকার চূর্ণ করার জন্যই বাবা এই অস্ত্রটি ব্যবহার করলেন- ভবিষ্যতে যাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে নিরাভিমানী ও বিনম্র হয়ে থাকি। কিংবা এটা কি আমার বাক্‌চাতুর্য্যর প্রশংসা? ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টিপাত করলে বোধ হয় যে, বাবার দ্বারা 'হেমাডপন্ত' উপাধিটি দেওয়া কতটা অর্থপূর্ণ ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হয়েছিল। (সবাই জানে যে কালান্তরে দাভোলকর শ্রী সাই বাবা সংস্থানের পরিচালনা অত্যন্ত বিলক্ষণ ভাবে করে গেছেন এবং তার সাথে-সাথে মহাকাব্য 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' রচনা করেন। এই গ্রন্থে গুরত্বপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির, যেমন- জ্ঞান, বৈরাগ্য, শরণাগতি ও আত্মনিবেদন ইত্যাদির সমাবেশ পাওয়া যায়।)

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ঃ-

এ বিষয়ে বাবার কি মত ছিল, তার উপর হেমাডপন্তদ্বারা লিখিত কোন লেখনী বা স্মৃতি পত্র নেই। কিন্তু কাকাসাহেব দীক্ষিত এই বিষয় একটি লেখনী প্রকাশ করেছেন। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার পরের দিন 'হেমাডপন্ত' এবং কাকাসাহেব বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে মস্‌জিদে গেলেন। বাবাও স্বীকৃতি দিয়ে দেন। কেউ প্রশ্ন করল - "বাবা, কোথায় যাই?" উত্তর এলো - "উপরে যাও।"

প্রশ্ন - "পথ কেমন?"

বাবা - অনেক পথ আছে। একটা পথ এখান থেকেও হয়ে যায়। কিন্তু এই পথ খুবই দুর্গম ও জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের ভয়ও আছে

কাকাসাহেব - যদি পথ প্রদর্শক সঙ্গে থাকে, তাহলে?

বাবা - তাহলে কোন কষ্ট হবে না। সে তোমায় শেয়াল-কুকুর থেকে রক্ষা করে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে জঙ্গলে পথ ভুলে যাওয়ার বা গর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এই বার্তালাপের সময় দাভোলকর সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। উনি ভাবলেন যে যা কিছু বাবা বলছেন সেটা ওঁরই প্রশ্নের উত্তর যে গুরুর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি? উনি একেবারের মতন মনে ঠিক করে নেন যে, এই বিষয়ে আর কোনদিন বাদ-বিবাদ করবেন না যে, স্বাধীন বা পরাধীন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কিরূপ সফল হয়? বরং পরমার্থ লাভের পথে গুরুর উপদেশ পালন করাই উচিত। এই উপদেশগুলির বর্ণনা মূল গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে করা হয়েছে, যাতে লেখা আছে যে শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ মহান অবতার হওয়া সত্ত্বেও আত্মানুভূতির জন্য শ্রীরামকে গুরু বশিষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণকে গুরু সন্দীপনীর শরণে যেতে হয়েছিল। এই পথে উন্নতির জন্য শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য - এই দুটি গুণের আশ্রয় নিতে হয়।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।